শীর্ষ ১০ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত সরকারের



ছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষ ১০ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং কর ফাঁকির অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার দাবি উঠেছে। প্রাথমিকভাবে অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এসব গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১১টি সংস্থার সমন্বয়ে পরিচালিত যৌথ তদন্তের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, কর ও শুল্ক ফাঁকি এবং বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারও সেই কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন, জেমকন, নাসা, বসুন্ধরা, সিকদার এবং আরামিট গ্রুপকে। একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন মামলা করার সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, যৌথ তদন্ত দল অভিযোগগুলোর অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। এখন এসব তথ্য আদালতে উপস্থাপন করে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হবে।

জানা গেছে, তদন্তের মূল দায়িত্ব পালন করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পুরো কার্যক্রমের সমন্বয় করেছে বিএফআইইউ এবং আইনি সহায়তা দিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়।

প্রতিটি গ্রুপকে পৃথকভাবে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তকারী দলগুলোকে সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় অনুসন্ধান পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তদন্তের তথ্য ও কার্যক্রমের গোপনীয়তা এবং সংবেদনশীলতা কঠোরভাবে বজায় রাখার নির্দেশও ছিল।

গত ২ ডিসেম্বর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পৃথক চিঠির মাধ্যমে বিএফআইইউকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ও বিধিমালার আওতায় এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যৌথ তদন্ত শুরুর বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত জানায়। পরে ৬ জানুয়ারি যৌথ তদন্তের নেতৃত্ব, কাঠামো এবং কার্যপরিধি চূড়ান্ত করা হয়।

দুদক, সিআইডি এবং কাস্টমস গোয়েন্দাকে পাঠানো বিএফআইইউর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাৎ, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। পাশাপাশি কর ও শুল্ক ফাঁকি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগও তদন্তের আওতায় আনা হয়।

ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল, অনুসন্ধান ও তদন্তের অগ্রগতি এবং হালনাগাদ প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স ও বিএফআইইউকে সরবরাহ করতে হবে।

তদন্তের আওতায় থাকা অধিকাংশ শিল্পগোষ্ঠীর ব্যাংক হিসাব ইতোমধ্যে জব্দ করেছে বিএফআইইউ। পাশাপাশি তাদের মালিকানাধীন সম্পদ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ, সেই ঋণের ব্যবহার, অর্থের গতিপথ, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং ঋণের সুবিধাভোগীদের বিষয়েও অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে তাদের সম্পদের তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সভাপতি মাসরুর আরেফিন সাংবাদিকদের জানান, যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে, সেসব ব্যাংককে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

মাসরুর আরেফিন বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর সময়সাপেক্ষ। তবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এসব অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নির্দেশনা দিয়েছেন।

সূত্র: আগামীর সময়।